December 2002
Vol 4 No 3

সউদ চৌধুরী ও আবুল বাশার
স্বাধীনতা যুদ্ধ:ক্ষয়ক্ষতির হিসেব
সাক্ষাতকার
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
এবং
জ্যাক প্রেভেরের কবিতা
Ethnic Cleansing in Gujarat
Himani Bannerji
South Asian Couples
Manisha Roy

বাংলাদেশে মূল্য ২৫ টাকা • ভারতে মূল্য ২০ রুপী
CANADA $ 6.00 • US $ 5.00 • ISSN 1488-0792

বাংলা জার্নাল

বাংলা ও বাঙালি বিষয়ক জার্নাল

Bangla Journal

a journal on bangla and bangalee

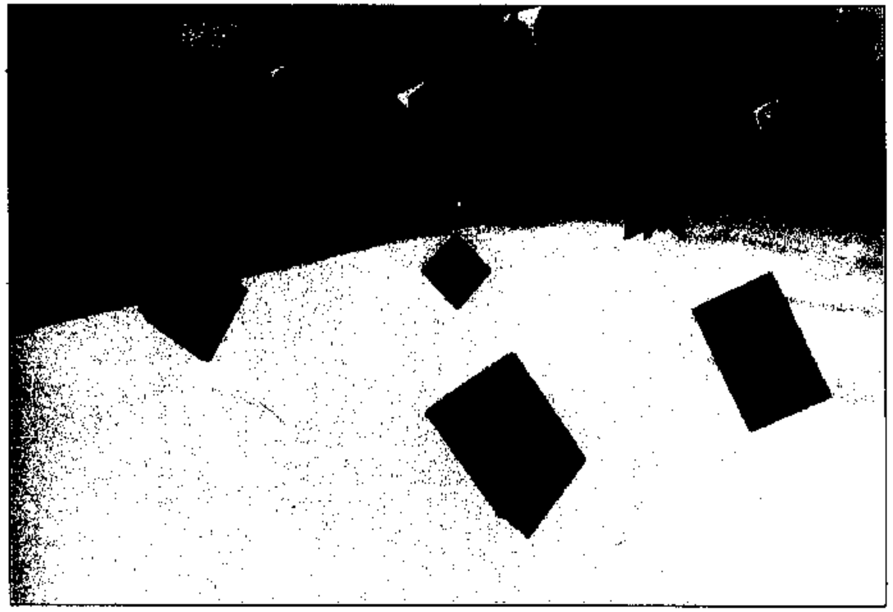

পৌষ ১৪০৯ ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
December 2002 Vol 4 No 3

শিল্পকাজের কথা

জীবনের সব ঘটনা মনে রাখা সম্ভব নয় কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা আছে যা কখনো ভোলা যায় না। তাছাড়া কিছু স্মৃতি থাকে যা কখনো ভুলে যাওয়া উচিতও নয়। বাঙালিদের জন্যে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ সেরকম এক স্মৃতি। 'স্মারকনামা' শিল্পকাজের মাধ্যমে আমি বীরত্ব ও গৌরব ছাড়াও যুদ্ধের এমন কিছু স্মৃতিকে উন্মোচন করতে চেয়েছি যা শোকের, ব্যর্থতার এবং হতাশার। এই শিল্পকাজ উৎসর্গ করেছি তাদের যারা যুদ্ধে অংশ নিয়ে এখনও ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে দমন-পীড়নের শিকার এবং যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি দ্বারা প্রতিনিয়ত তাড়িত।

বর্তমান বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ যেন একটি এলিট সোসাইটির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় মুক্তিযুদ্ধ যেন কয়েকজন বিখ্যাত সেনানায়ক, মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপার। অথচ মুক্তিযুদ্ধে যে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া এতো অল্প সময়ে বিজয় অর্জন সম্ভব ছিল না তা আমরা ভুলতে বসেছি। তাছাড়া যেকোন যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সমাজদেহে থেকে যায়, কেউই এই প্রভাবের বাইরে থাকতে পারে না। জার্মানির (যেখানে আমি দেড় দশক ধরে বসবাস করছি) দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'স্মারকনামা'র জন্য আমি বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্র থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত প্রায় তিনশ কাহিনী, স্মৃতিকথা, সাক্ষাতকার এবং খবর জোগাড় করেছি। প্রত্যেকটা ঘটনাকে ঘিরে তৈরি করেছি এক একটি বই। বইয়ের মলাট করেছি কালো রংয়ে এবং বিভিন্ন সাইজে তবে কোন শিরোনাম দিই নি। ১৯৯৮ সালে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের গ্যালারীর প্রদর্শনী কক্ষে বইগুলো ওপর থেকে ঝুলিয়ে নীচের মেঝে সাদা কাপড়ে ঢেকে দিয়েছিলাম। চেয়েছি দর্শক যখন এক বই থেকে আরেক বইয়ের দিকে গিয়ে একের পর এক সেসব ঘটনার কাহিনী পড়বে তখন সে যেন নিজেই হয়ে ওঠে এসব অভিজ্ঞতার অংশ এবং সাদা থানে রেখে যায় পদচিহ্ন। আমার বিশ্বাস তথ্যের আদান প্রদান, আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে আমাদের উপলব্ধি গভীরতর হবে এবং এই শিল্পকাজের মধ্য দিয়ে আমি চেয়েছি চিন্তার জগতে নান্দনিকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে।

যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার উপস্থাপনা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে ভাবতে চেয়েছি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মাধ্যমে। নানকারণে বিদেশে বাঙালিরা বসবাস করছে অধিক হারে। দেশের সাথে যোগাযোগের জন্যে ব্যবহার করছে প্রতিষ্ঠিত মাধ্যম ইন্টারনেট। বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে প্রজন্মান্তরে ভাবনা আদানপ্রদানের জন্য 'স্মারকনামা'র ইন্টারনেট উপযোগী উপস্থাপনার চেষ্টা করেছি ইন্টারনেটের www.wakil-art.de ঠিকানার মাধ্যমে যার শুরুর ছবিটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রচ্ছদে।

ওয়াকিলুর রহমান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী তাৎপর্য : অর্থনৈতিক লোকসান ও পরিণতি বিষয়ে একটি সমীক্ষা

সউদ চৌধুরী • সৈয়দ আবুল বাশার

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মানবিক ও অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার স্থায়িত্বকাল কেবল ন' মাসের। হলে কি হবে, এই যুদ্ধ কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির চারিত্র্য, তার গতি এবং সম্ভাবনার চেহারাটাই আমূল পাল্টে দিয়েছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছিল; ধনসম্পদ হয়ে গিয়েছিল হাওয়া, আর সামান্য যেটুকু মূলধনী পুঁজি ছিল তাও করা হলো নস্যাৎ কিংবা ব্যবহারের অনুপযোগী। বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিতে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসান কতটুকু তার একটা হিসেব-নিকেশ করার চেষ্টা এই নিবন্ধে করা হয়েছে। একেবারে ন্যূনতম অংকের হিসেবেও প্রত্যক্ষ ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসানের পরিমাণ ২০.৩৮ বিলিয়ন ডলার এবং পরোক্ষ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৪.০৮ বিলিয়ন ডলার যা কিনা জাতিসংঘের ত্রাণ কর্মসূচির জরীপে অনুমিত ২০০ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে ঢের বেশি। মোদ্দা কথায় যুদ্ধটা সাধারণ কোন ঘটনা ছিল না। কেবল ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকেই নয় অন্যান্য অনেক বিষয়ে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

বাংলাদশের স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৯৭১)[১] কেন সংঘটিত হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা বিতর্ক প্রচুর হয়েছে। এ নিয়ে প্রচুর তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা দেয় হয়েছে এবং এখনও দেয়া হচ্ছে যার দরুন বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চায় প্রসংগটিকে সর্বাধিক চর্চিত বললে অত্যুক্তি হবে না। ফলে হয়েছে কি যুদ্ধের কারণ নির্ণয়ে এখন অনেক ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যার মধ্যে গোষ্ঠীবাদ; আঞ্চলিকতা, অর্থনৈতিক বৈপরীত্য, রাজনৈতিক অদক্ষতা ইত্যাদি ভাবধারার কথা চলে আসে এবং এর মধ্যে কোন একটাকে বেছে নিয়ে যে অন্যসবকে খারিজ করে দেবো তারও উপায় নেই। যুদ্ধের রাজনৈতিক এবং সামরিক ঘটনাবলী পর্যালোচনার ব্যাপারে গবেষকদের যথেষ্ট আগ্রহী দেখা যায় এবং লেখালেখিও প্রচুর তবে আশ্চর্যজনকভাবে যে দিকটা অবহেলিত রয়ে গেছে তা হচ্ছে যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির একটা নিরাসক্ত মূল্যায়ন। সত্যি বলতে কি, যুদ্ধের তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কী তা নির্ণয়ের চেষ্টা আজও হয় নি। এ ব্যাপারে যেটুকু গবেষণা হয়েছে তাকে

বড়জোর অনির্দিষ্ট বলা যায়, কারণ এসব গবেষণায় মূলত দৃষ্টি দেয়া হয়েছে কত লোক হতাহত এবং কত টাকার স্থাবর সম্পদ ধ্বংস হয়েছে তার ওপর। কেউ কেউ আবার মূল্যহ্রাস ও মুদ্রাবিস্ফীতির অনুষঙ্গটি হিসেবে না ধরায় বিষয়টার হিসেব-নিকেশে বাড়তি সমস্যা সৃষ্টি করেছেন।[২]

অভিজ্ঞতানির্ভর পর্যবেক্ষণের বিদ্যমান ধোঁয়াশায় বিশ্লেষণমুখী স্বচ্ছ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যুদ্ধের ফলে প্রত্যক্ষ লোকসান এবং এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ লোকসান বা ক্ষয়ক্ষতি হিসেবের মধ্যে নেওয়া উচিত। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে রয়েছে: সামরিক উদ্দেশ্যে সম্পদের ধ্বংসসাধন এবং লুণ্ঠন, স্থায়ী স্থাপনার ক্ষতিসাধন, স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে ছেদজনিত লোকসান, জোরপূর্বক সামরিক কাজে নিয়োগ এবং প্রাণহানিতে নিহিত জনশক্তি সম্পদের ক্ষতি, ভোগ্যপণ্যের হ্রাসকৃত চাহিদার দরুন ক্ষতি ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের ফলে কল-কারখানাগুলোর দৃশ্যতঃ যে কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে তাকেও হিসেবের মধ্যে আনা উচিত। বাংলাদেশে অঞ্চল এবং শিল্পভিত্তিক বিস্তারিত উপাত্তের অনুপস্থিতে তা সম্ভব নাও হতে পারে। উপাত্তের সীমাবদ্ধতা থাকায় যুদ্ধের সার্বিক অর্থনৈতিক লোকসান বা ক্ষয়ক্ষতির পদ্ধতিগত হিসেবের আওতায় সকল বিষয় আনা সম্ভব হয় না। ফলে ছাত্র এবং শিক্ষকরা এ বিষয়ে কোন আলোচনা করতে গেলে তাদেরকে কেবল প্রাসঙ্গিক এবং প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতেই তা করতে বলা হয় যাতে তাদের আলোচনা আবেগনির্ভর না হয়ে পড়ে সেই অজুহাতে। আমাদের পদ্ধতিকে সর্বব্যাপী বলে দাবী করছিনা তবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে আশা করা যায় যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত বৃহত্তর সমস্যাগুলো নতুন আলোকে দেখা সম্ভব এবং সেইসাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে আরও গবেষণা ও পর্যালোচনার পথ প্রশস্ত করবে।

ওপরের ভূমিকা বাদ দিলে আমাদের আলোচনা তিনটা ভাগে বিন্যস্ত। প্রথম ভাগে দেখানো হয়েছে যুদ্ধের কারণে প্রত্যক্ষ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাবর ও মানবপুঁজির (Human Capital) যোগফল। মানবপুঁজি বিনষ্টির হিসেবটা আমরা করেছি যুদ্ধে মৃত ব্যক্তি যে রোজগার করার কথা ছিল তার পরিমাণ এবং এর ফলে মোট জাতীয় উৎপাদনের যে লোকসান হলো তা

নির্ণয়ের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে আগের হিসেব-নিকেশের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা এবং সম্পূরক হিসেবে যুদ্ধচলাকালীন এবং পরবর্তী প্রজন্মের ওপর যুদ্ধের কারণে পরোক্ষ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। হিসেবটা করা হয়েছে যুদ্ধবিহীন এক অর্থনীতির কথা অনুমান করে যেখানে দেখানো হয়েছে যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ওই অর্থনীতিতে স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও একই হারে বাড়ছিলো। কল্পিত যুদ্ধবিহীন পরিস্থিতিতে ভোগ্যপণ্যের চাহিদার সাথে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বিরাজমান প্রকৃত ভোগ্যপণ্যের চাহিদার যে ফারাক তাকেই আমরা যুদ্ধের পরোক্ষ লোকসান বলে ধরেছি। সবশেষে তৃতীয়ভাগে রয়েছে উপসংহার এবং সার্বিক লোকসান বা ক্ষয়ক্ষতির যোদ্ধা হিসেব।

১. যুদ্ধের প্রত্যক্ষ লোকসান বা ক্ষয়ক্ষতি

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে সাধারণত হিসেব করা হয় যুদ্ধের জন্যে কী পরিমাণ টাকা খরচ এবং মানুষ ও সম্পদের কী পরিমাণ লোকসান হয়েছে। তবে বর্তমান আলোচনায় যুদ্ধের জন্যে কী পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছিল সেই সংখ্যাটা বলতে গেলে অনুপস্থিত এবং যা কিনা প্রবাসী অস্থায়ী সরকারের কপর্দকহীন অবস্থার নজির।[৩] সহানুভূতিসম্পন্ন বিদেশী সরকার, বেসরকারী সাহায্য সংস্থা, ইংল্যাণ্ড এবং উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালিরা[৪] ছাড়াও অবরুদ্ধ ভূখণ্ডে অবস্থানকারী লোকজনসহ বিভিন্ন সূত্র থেকে যে আর্থিক সাহায্য আসছিল তার হিসেব সঠিকভাবে রাখা সম্ভব হয় নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও ইচ্ছেকৃতভাবে গাফেলতি করা হয়েছে। যুদ্ধ চালানোর জন্যে সঠিক খরচের উপাত্ত অসম্পূর্ণ থাকার আরেকটি কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের বলতে গেলে কোন বেতনই দেয়া হত না আর দেওয়া হলেও তা এত অনিয়মিত ছিল যে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তা সত্ত্বেও টাকার অংকে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাবর সম্পদ এবং লোকক্ষয়ের মূল্য হিসেব করে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ক্ষয়ক্ষতির একটা যুক্তিগ্রাহ্য পরিমাণ অনুমান করা সম্ভব মনে হয়। একটু আগে যেসব উপাত্তের ঘাটতির কথা উল্লেখ করেছি তার দরুন আমাদের করা টাকার অংকে নিরেট আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে কোন তারতম্য হবে না কারণ যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল কেবল ন' মাসের মত আর মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই যোগ দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়।

মূলধনের বিনষ্টি

মূলধনের বিনষ্টি পরিমাপ করা হয়েছে যুদ্ধপূর্ব (১৯৭০) এবং যুদ্ধোত্তর (১৯৭৩) সময়ের মূলধনের মধ্যেকার মূল্যের তারতম্য হিসেব করে। যুদ্ধপূর্ব

এবং যুদ্ধোত্তর সময়ের সংখ্যা দুটো নেয়া হয়েছে Easterly, W and Levine, R. (1999) গবেষণা থেকে কিছুটা ঘষামাজা করে যাতে তুলনাটা সহজ হয়। আর এটা করা হয়েছে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মূলধনের যে শেয়ার মূল্য ছিলো তাথেকে যুদ্ধোত্তর মূলধনের শেয়ারের হ্রাসকৃত এবং সংকুচিত মূল্যকে বাদ দেয়ার মাধ্যমে। সারণী ১-এ তিনটি বিকল্প মূল্যহ্রাসের নিরিখে স্থাবর সম্পদ বিনষ্টির পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

সারণী ১: স্থাবর সম্পদ ধ্বংসসাধন (মার্কিনী বিলিয়ন ডলারের অংকে)

মূল্যহ্রাসের হার	যুদ্ধোত্তর মূলধন[ক] পুঁজির হ্রাসকৃত পরিমাণ	১৯৭০ সালের মূলধন পুঁজি	যুদ্ধে বিনষ্ট মূলধনপুঁজি	(%) হারে যুদ্ধপূর্ব মূলধন পুঁজির বিনষ্টি
৫.০০%[খ] ব্যাংক হার	৩৬.৪৮	৪৫.১৫	৮.৬৭	১৯.১৮
৫.৫০%[গ] মুদ্রাবাজারের হার	৩৫.৯৭	৪৫.১৫	৯.১৮	২০.৩২
১০.০০% প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র হার	৩১.৭৩	৪৫.১৫	১৩.৪১	২৯.৭২

দ্রষ্টব্য:

ক: যুদ্ধ পরবর্তী মূলধন পুঁজির পরিমাণ হচ্ছে মার্কিনী ৪২.২৪ বিলিয়ন ডলার। মূল্যহ্রাসের এই হারটা নেয়া হয়েছে আইএমএফ এর ১৯৭৭ সালের বর্ষপঞ্জি থেকে। আমরা এখানে (Easterly, W and Levine, R.(1999) গবেষণায় প্রাপ্ত মূলধন পুঁজির সংখ্যাটাই ব্যবহার করেছি।

খ: ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে ব্যাংক আমানতের হার। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মূল্যহ্রাসের হারও ছিল ৫.০০%।

গ: ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের মুদ্রাবাজারের হার।

মূল্যহ্রাসের তিনটি বিকল্প হিসেবেই দেখা যায় কত ভয়াবহ এই লোকসান। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে ব্যাংকে আমানতের হার ছিল ৫.০০%; ১৯৭১ সালে বাংলাদেশেও হ্রাসকৃত হার ছিল ৫.০০%। ব্যাংকের এই মূল্যমানে হিসেব নিলে দেখা যায় ১৯৭০ সালে যেখানে মূলধন পুঁজির পরিমাণ ছিল ৪৫.১৫ বিলিয়ন ডলার, সেখানে যুদ্ধের পর হ্রাসকৃত মূলধন পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬.৪৮ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ যুদ্ধে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ৮.৬৭ বিলিয়ন ডলারের

মূলধন পুঁজি। এই ধরনের হিসাবে যুদ্ধপূর্ব মূলধন পুঁজির বিনষ্টির হার গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ১৯.১৮ শতাংশ। মুদ্রাবাজারের ৫.৫০% হারে (১৯৭০ সালে পাকিস্তানের মুদ্রাবাজারে প্রচলিত হার) হিসেব করলে দেখা যায় ১৯৭০ সালের ৪৫.১৫ বিলিয়ন ডলারের মূলধন পুঁজি যুদ্ধোত্তর সময়ে হ্রাস পেয়ে ৩৫.৯৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। যুদ্ধে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ৯.১৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বিনষ্টির হার ২০.৩২ শতাংশ। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়ী সনদপত্রের ১০.০০% হারে যদি এই লোকসানের হিসেব নিই তালে দেখতে পাই ৪৫.১৫ বিলিয়ন ডলারের মূলধন পুঁজি যুদ্ধোত্তর সময়ে হ্রাস পেয়ে ৩১.৭৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াচ্ছে। যুদ্ধে নষ্ট মূলধন পুঁজির পরিমাণ ১৩.৪১ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ বিনষ্টির হার ২৯.৭২ শতাংশ।

উপরের হিসেব থেকে দেখা যায় কাঁচামাল বা রসদ ধ্বংস হওয়ার পরিমাণ কত ব্যাপক ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশকে যেরকম অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ওলটপালট এবং এরফলে দুর্ভোগ পোহাতে ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে সেরকম ক্ষতি এধরনের স্বল্পমেয়াদী যুদ্ধে কদাচিৎ হতে দেখা যায়। পূর্বোল্লিখিত হিসেবে এমনকি ৫ শতাংশের মত পরিমিত হ্রাসকৃত হারে নষ্ট হয়ে যাওয়া মূলধন পুঁজির পরিমাণ ৮.৬৭ বিলিয়ন ডলার (অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় দেশের বিরাজমান মূলধন পুঁজির এক পঞ্চমাংশের সমান।) সবচে বেশি ক্ষতিসাধন হয়েছিল পরিবহন ব্যবস্থার। পরিবহন ব্যবস্থাকে পুনরায় আগের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বেশ ক'বছর সময় লেগে গেছে। এই সমস্যা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের কাজে বড় ধরনের বাধার সৃষ্টি করে কেননা মালামালের অবাধ চলাচলে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছিলো।

পূর্বোক্ত হিসেবকে একেবারে নির্ভুল এবং সঠিক এমন দাবী করছি না তবে নিবন্ধে আমরা এই ধারণাটাই দিতে চাই যে সঠিক হিসেব করতে হলে কিছু মানদণ্ডের প্রয়োজন। আমাদের হিসেবে আমরা ভুল করে থাকতে পারি, যদি করেও থাকি সেটা হবে ধনসম্পদ লোকসানের প্রকৃত পরিমাণকে কমিয়ে দেখানোর ক্ষেত্রে। যুদ্ধের লাগামহীন ধ্বংসসাধনের পূর্ণাঙ্গ হিসেব না থাকার কারণে লোকসানের পরিমাণ কমিয়ে দেখানোর প্রবণতাটা হয়। সমর-সাংবাদিক এবং পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত এলাকায় পুরো গ্রাম, শস্যগুদাম, কল-কারখানা, পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ি (মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের হতে পারে) সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল।

এমন কি যেসব এলাকা যুদ্ধমুক্ত ছিল সেখানেও সম্পত্তির দেখাশোনা হয় নি যার জন্য মূল্যমান কমে গিয়েছিল। সমস্যা যেখানে এত ব্যাপক সেখানে একেবারে নির্ভুল হিসেব-নিকেশ প্রায় অসম্ভব কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ব্যাপকতা আঁচ করার জন্যে সংখ্যা দিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ।[৬]

মানবপুঁজির (Human Capital) লোকসান

আমাদের করা প্রত্যক্ষ ক্ষয়ক্ষতির হিসেবের আরেকটি অংশ হচ্ছে যুদ্ধে প্রাণহানির সংখ্যা। প্রকৃত প্রাণহানির সংখ্যা জানা যায় নি তবে আনুমানিক হিসেবে সংখ্যাটা ৩,০০০০০ থেকে শুরু করে ১২,৪৭০০০ (Rummel; 1997:331)[৭] পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে। প্রাণহানির দুটো সংখ্যার ভিত্তিতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণটা নীচের সারণি থেকে বোঝা যাবে। সরকারী নথিতে যেহেতু যুদ্ধে নিহতদের বয়স, লিঙ্গ, পেশা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য নাই সেহেতু আমরা নিহতদের সমপ্রকৃতির একটা দল হিসেবে বিবেচনা করেছি। কোন বিশেষ একটি বছরের মাথাপিছু আয় বলতে ধরা হয়েছে একজন ব্যক্তির বার্ষিক উপার্জন যদি সেই ব্যক্তি যুদ্ধের বছরটিতে প্রাণে বেঁচে গিয়ে থাকে। এছাড়াও যুদ্ধে নিহত প্রত্যেকের কর্মজীবন ২৫ বছর করে ধরে নেয়া হয়েছে। এই অনুমানের ভিত্তিতে বর্তমানে (নিহত) ব্যক্তির উপার্জন কত হতে পারতো তার হিসেব নীচের সূত্র দিয়ে কষা সম্ভব:

$$Gi = \lim_{n_i \to 25} \int_0^{n_i} Gi \exp(-\rho_i^t)\, dt$$

Gi হচ্ছে যুদ্ধে নিহত একক র ব্যক্তির গড় আয় যত হতে পারতো তার সূচক

ρ_i হ্রাসের হার

n_i একক ব্যক্তির কাজের ক্ষেত্র

t কর্মজীবনের সময়সীমা

যুদ্ধে একজন ব্যক্তি নিহত হওয়ার ফলে আর্থিক লোকসান কতটুকু তা হিসেব করা হয়েছে বেঁচে থাকলে ওই ব্যক্তি যে উপার্জন করতো তার বর্তমান মূল্যমান থেকে। একজন নিহত ব্যক্তির কারণে আর্থিক লোকসানের যে অংক পাচ্ছি তাকে যুদ্ধে মোট প্রাণহানির সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে লোকসম্পদের

সার্বিক লোকসানের একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া যায়।

মানবপুঁজির আওতায় আমরা যুদ্ধে আহত এবং পঙ্গু যারা হয়েছে তাদের উপার্জনক্ষমতাকেও বিবেচনায় নিয়েছি। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাটা আমরা নিয়েছি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের লিপিবদ্ধ তথ্য থেকে। এই সংস্থাটি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্ব স্ব শারীরিক অক্ষমতা যাচাই সাপেক্ষে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। তাদের দেয়া টাকার এই অংকটা আমরা লোকসানের হিসেব-নিকেশে ব্যবহার করেছি। এই বিভাগে মানবপুঁজির ক্ষয়ক্ষতি হিসেব করতে গিয়ে আমরা ধরে নিয়েছি বাকীজীবন হুইলচেয়ারে বন্দীদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উপার্জনের পুরোটাই শূন্য; শতকরা ২০ থেকে ৬০ ভাগ অক্ষমদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০ শতাংশ কম উপার্জন এবং সবশেষে শতকরা ৬০ থেকে ৯০ ভাগ অর্থাৎ যাদের অক্ষমতা গুরুতর তাদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ কম উপার্জন। যুদ্ধের ফলে যেসব বেসামরিক লোকজন পঙ্গুত্ব বরণ করেছে তারা বাদ পড়ে যাওয়ায় এই হিসেবের মধ্যে একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে । মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কেবল যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিল শুধু তাদেরই দেখাশোনা করে থাকে সুতরাং যুদ্ধাহত বেসামরিক লোকজনের কোন নির্ভরযোগ্য হিসেবের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না।[৮]

সারণী ২: যুদ্ধে প্রাণহানির দরুন ভিন্ন মূল্যহ্রাসের হিসেবে আর্থিক লোকসান (বিলিয়ন ডলারে)

	৫%	১০%
যুদ্ধাহত (সব শ্রেণীভুক্ত)	০.০০১১	০.০০৬
যুদ্ধে প্রাণহানি[ক]	০.৮৫৭	০.৪৯৮৯
যুদ্ধে প্রাণহানি[খ]	৩.৫৬৬	২.০৭৪

দ্রষ্টব্য:

ক: যুদ্ধে প্রাণহানি ৩,০০০০০ ধরলে আর্থিক লোকসান

খ: যুদ্ধে প্রাণহানি ১২,৪৭,০০০ ধরলে আর্থিক লোকসান

সারণী ২ থেকে দেখা যায় প্রাণহানি এবং হ্রাসের হারের দুটো ভিন্ন হিসেবে বাংলাদেশে মানবপুঁজির ক্ষয়ক্ষতি ০.৮৬ বিলিয়ন অথবা ৩.৫৭ বিলিয়ন ডলার। তাছাড়া খেয়াল রাখা উচিত যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রকৃত আয়

বলতে কিছুই ছিলনা এবং ভোগের (বিপুলভাবে হ্রাস পায়) জন্যে জমানো পুঁজি ভাঙ্গিয়েই চলতে হয়েছে। নগণ্য ০.৮৬ বিলিয়ন ডলারের মানবপুঁজির লোকসানও যদি হিসেবে নিই তা যুদ্ধপূর্ব মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ১৩.২ শতাংশের সমপরিমাণ হবে। এ থেকে প্রমাণ হয় যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয় করতে গেলে কেবল মূলধন পুঁজি ধ্বংসের হিসেব নিলে চলবে না যুদ্ধের ফলে ব্যক্তিগত আর্থিক লোকসান এবং তজ্জনিত সামাজিক দুর্ভোগের হিসেবও করতে হবে।

মানবপুঁজি ধ্বংসের লোমহর্ষক দিক হচ্ছে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা পরিচালিত হয়েছিল লিঙ্গবিশেষ এবং সমাজের বিশেষ শ্রেণীর প্রতি। Mascarenhas, A. (1972:116-117) এর মতে এই ধ্বংসযজ্ঞ ছিল সুপরিকল্পিত এবং নির্যাতনের শিকার যারা তাদেরকে ওই উদ্দেশ্যেই বেছে নেয়া হয়েছিল:

আওয়ামী লীগের (বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দল) সদস্য - সকল নির্বাহী সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবী এমনকি পদাধিকার বলে সর্বনিম্নপর্যায়ের কর্মী পর্যন্ত ... কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যে অধিকতর জঙ্গি সদস্য...অধ্যাপক শিক্ষকদের মত বাঙালি বুদ্ধিজীবী যে কাউকেই সেনাবাহিনী যখন ইচ্ছা 'মুক্তিযোদ্ধা' বলে সন্দেহ করেছে।

ম্যাসকারেনাস তাঁর আলোচনায় নির্যাতীত ব্যক্তির সাথে সে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের মধ্যে যে একটা স্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে তার ইংগিত দিয়েছেন। অল্প কথায় এটা ছিল এমন এক সুপরিকল্পিত কৌশল যাতে একটা জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার পথ হিসেবে প্রায়শ আক্রমণটা চলতো যুবক পুরুষদের লক্ষ্য করে।৯ হতাহতদের অধিকাংশই যেহেতু বুদ্ধিজীবী এবং কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রসম্প্রদায়ভুক্ত সেহেতু বৈদেশিক মুদ্রার্জন হিসেবে আমরা যে মাথাপিছু আয়কে বিবেচনা করেছি তা যথাযথ মনে হয়।

এখানে উল্লেখ করা দরকার উপরে বর্ণিত হিসেবে যুদ্ধের পুরো সময়টা জুড়ে বাঙালি নারী অর্থাৎ লিঙ্গবিশেষের প্রতি সংঘটিত নৃশংসতার দরুন কী পরিমাণ আর্থিক লোকসান হয়েছে সেটা কিন্তু আসে নি। নারীর সম্ভ্রম ও কুমারীত্ব রক্ষা করা যে সমাজে মুখ্যনীতি বলে বিবেচিত সেখানে যুদ্ধে ঠিক কতজন ধর্ষণের শিকার হয়েছে তার প্রকৃত সংখ্যা জানা অসম্ভব। Brownmiller, S., (1993:81) তাঁর গবেষণায় ধর্ষণের শিকার হিসেবে তিনটি ভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ করেছেন, যথা - ২০০০০০, ৩০০০০০, অথবা ৪০০০০০। সংখ্যার

ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়া এখানে অবান্তর কেননা ন্যূনতম ২০০০০০ সংখ্যাটাই যদি ধরি তাহলে বাংলাদেশের ১৯৭১ এর ঘটনাবলীর সাথে তুলনা হতে পারে কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নানজিংয়ে সংঘটিত জাপানীদের দ্বারা কুখ্যাত ধর্ষণ এবং রাশিয়ায় জার্মানদের পরিচালিত বর্বরতার। ধর্ষণের ফলে ভুক্তভোগীর আর্থিক লোকসান কী পরিমাণ তা টাকার অংকে পরিমাপ করা সম্ভব নয় কারণ যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছে তাদের জীবনের ওপর ওই ঘটনার ফলাফল সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত নন।

সারণী ৩: যুদ্ধে প্রত্যক্ষ মোট লোকসান (মার্কিনী বিলিয়ন ডলারের অংকে)

	হিসেব ১*	হিসেব ২*
মূলধন পুঁজির বিনষ্টি	১৯.১৮	১৯.১৮
মোট মানব পুঁজির লোকসান	০.৮৫৮	৩.৫৬৬
মোট প্রত্যক্ষ লোকসান	২০.০৩৮	২২.৭৫

দ্রষ্টব্য:

ক: ৫ শতাংশ মূল্যহ্রাসের হার এবং ৩,০০০০০ প্রাণহানির হিসেবে।

খ: ৫ শতাংশ মূল্যহ্রাসের হার এবং ১২,৪৭,০০০ প্রাণহানির হিসেবে।

সারণী ৩ দেখে সংক্ষেপে বলা যায় যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসানের পরিমাণ ছিল ব্যাপক। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা ও রাজনীতিকে মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার ধরা পড়ে বিবদমান দুই পক্ষই তাদের কর্মকাণ্ডের পরিণতিকে আমলে নেয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানীরা ধারণা করেছিল সংঘাতটা রাষ্ট্রের আইন ও সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করার সাময়িক 'পুলিশী ব্যবস্থা'র বেশি কিছু নয়; একইভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা (বাংলাদেশী) আশা করেছিল যুদ্ধ হবে ক্ষণস্থায়ী তাই অল্প ক্ষতি স্বীকারই উচিত বিকল্প। স্পষ্টত তাদের জন্যে যুদ্ধের সবচে বেশি অবাক করা বিষয় ছিল ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপক পরিমাণ।

২. যুদ্ধের পরোক্ষ লোকসান

প্রত্যক্ষ লোকসানের পূর্বোক্ত হিসেব অপর্যাপ্ত হতে বাধ্য কেননা প্রকৃতপক্ষে সবধরনের লোকসান এতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এই অংশে আমরা ক্ষয়ক্ষতির

একটা বিকল্প (পরোক্ষ) হিসেব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি যেখানে যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির বাস্তব অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়েছে এক অনুমিত যুদ্ধমুক্ত অর্থনীতির। অনুমিত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে অনেক কিছুই হয়তো ধারণা করা যায় কিন্তু আমরা কেবল এটাই ধরে নিয়েছি যে অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় যা ছিল যুদ্ধমুক্ত অবস্থায় তাইই বজায় থাকতো। এই ধারাবাহিকতায় অনুমিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ হারে মাথাপিছু ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। স্বাভাবিক অবস্থায় ভোগ্যপণ্যের চাহিদার অনুমিত পরিমাণের সাথে ভোগ্যপণ্যের প্রকৃত বিদ্যমান চাহিদার তফাতকেই আমরা যুদ্ধের পরোক্ষ লোকসান হিসেবে ধরেছি। এই পন্থা অবলম্বনের পক্ষে আমাদের যুক্তি হচ্ছে যুদ্ধের সময় আয় সংকোচন নাও হতে পারে। বরং যুদ্ধের খরচ যোগানোর জন্যে বিপুল ব্যয়ের অংশ হিসেবে আয় বেড়েও যেতে পারে। অন্যদিকে যেকোন ক্ষেত্রেই যুদ্ধচলাকালে ভোগ্যপণ্য চাহিদার সংকোচন অনিবার্য তাই চাহিদার লুপ্ত অংশকে আমরা যুদ্ধজনিত লোকসানের যথার্থ সূচক হিসেবে বিবেচনা করেছি।

সারণী ৪: ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পরোক্ষ লোকসান: লুপ্ত ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের পরিমাণ (বিলিয়ন ডলারে)

বর্ষ	ভোগপণ্যের[ক] প্রকৃত পরিমাণ	ভোগপণ্যের[খ] অনুমিত পরিমাণ	হ্রাসের গুণনীয়কের[গ] বর্তমান মূল্যমান	পরোক্ষ লোকসান[ঘ] (৫%)[ঙ]	পরোক্ষ লোকসান (১০%)[চ]
১৯৭২	৪৬৮৫.৭৯৯৮৩৪	৫১৪৯.৪৯১৬৯১	০	৪৬৩.৬৯১৮৫৭৭	৪৬৩.৬৯১৮৫৭৭
১৯৭৩	৫৭৯৫.৪৫৪৬৫৬	৬৩৬৮.৯৫৪৪২৮	১	৫৪৬.১৯০২৫৮৯	৫২১.৩৬৩৪২৯
...	...	...		...	...
...	...	...		...	...
১৯৮১	১২৭১৭.৬৪১৬৩	১৩৯৭৬.১৩৯০২	৯	৮১১.২৩৮৬৪০৪	৫৩৩.৭২৫৭৪৭
১৯৮২	১০৭৫৫.০৭৫৫৫	১১৮১৯.৩৬৩৬৪	১০	৬৫৩.৩৮০৫৬৪৫	৪১০.৩২৯১৩১৪
...	...	...		...	...
...	...	...		...	...
১৯৯১	১৬৫৬৩.০৪৭৪২	১৮২০২.০৭৩৯৫	১৯	৬৪৮.৬১৮৪৫৩৩	২৬৭.৯৯৩৯৩৪৪
১৯৯২	১৬৩০৪.৪১১১২	১৭৯১৭.৮৪৩৮২	২০	৬০৮.০৮৫৮১৬১	২৩৯.৮২৬৪৯০১
মোট	২৪১৯০৬.১১২৪	২৬৫৮৪৪.৩৭২৪		১৪০৮৪.৪২৭৪৪	৯১৮২.৬৮৯০২

দ্রষ্টব্য:

ক: ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের প্রকৃত পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে Summers and Heston (1998), The Penn World Tables 5.6, Easterly

and Yu (2000), The Global Development Network Growth Database, World Bank ব্যবহার করে।

খ: অনুমিত ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্যে আমরা প্রথমে "যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের" ভোগ্যপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির হার (β) হিসেব করেছি। আমরা ১৯৬৫-৬৯ সময়টুকু যুদ্ধ-পূর্ব সময় হিসেবে বিবেচনা করেছি। আমাদের হিসেবে দেখা গেছে β হচ্ছে ০.০৯।

গ: হ্রাসের গুণনীয়কের বর্তমান মূল্যমান।

ঘ: পরোক্ষ লোকসানের হিসেব কষা হয়েছে $\Sigma X C_{tk} - C_{at} / (1+i)^{(t-1972)}$ সূত্র ব্যবহার করে।

ঙ: ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে ব্যাংক আমানতের হার।

চ: সেসময়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিগত সঞ্চয় পদ্ধতি– প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রের হার।

ওপরের সারণী থেকে দেখা যায় ১৯৯২ সাল পর্যন্ত অনুমিত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বিরাজমান প্রকৃত চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত যা থেকে প্রমাণ হয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার দু'দশক পরও অর্থনীতির ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উপার্জনের সুযোগ হারানোর ফলে সর্বস্তরের লোকজন যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে এসব পরোক্ষ লোকসান। ভোগ্যপণ্যের চাহিদার লুপ্ত পরিমাণ পরোক্ষ লোকসান হিসেব-নিকেশের প্রধান অংগ বিধায় উপার্জনের সবরকম প্রতিবন্ধকতাও এর আওতায় পড়েছে। অন্য কথায় যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া জনসাধারণ থেকে শুরু করে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, পঙ্গু হয়ে যাওয়া বেসামরিক ব্যক্তি, মানসিক আঘাতপ্রাপ্তা নারীসহ সর্বস্তরের লোকের দুর্ভোগকে আমরা হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি। প্রত্যক্ষ লোকসানের হিসেবে এই বিষয়গুলো ধর্তব্যের মধ্যে না আনার প্রবণতা লক্ষণীয়।

পরোক্ষ লোকসানের হিসেব মূল্যহ্রাসের দুটো ভিন্ন হারের ভিত্তিতে করে থাকলেও আমরা মনে করি এক্ষেত্রে অন্যান্য মূল্যহ্রাসের হার ব্যবহারও প্রযোজ্য। আমাদের হিসেবে দেখা যায় এমন কি নগণ্য ৫ শতাংশ মূল্যহ্রাসের হারে বাংলাদেশীদের ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থায় যে হারে বাড়ছিল তার তুলনায় প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার কম। যুদ্ধের পর দু'দশক অতিক্রান্ত হবার পরও এই লোকসান চলতে থাকার পিছনে নানবিধ কারণের কথা বলা হয় যার মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দরুন ব্যবসা-বণিজ্যের পথে প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গ প্রধান।[১০] এক্ষেত্রে আরেকটি ব্যাপারও প্রত্যেকের

খেয়াল রাখা উচিত পাকিস্তানের সাথে সকল অর্থনৈতিক সম্পর্ক ঘুচে যাওয়ার পর বাংলাদেশের সামনে একটা নতুন অর্থনীতি ঢেলে সাজানোর বিশাল কাজ পড়ে ছিল। পাকিস্তানে যেসব পণ্য রপ্তানী হতো তার জন্যে নতুন বাজার খোঁজা, কাঁচামাল বা রসদ যোগানোর নতুন উৎস বের করা, পাকিস্তানী মালিকদের পরিত্যক্ত শিল্প, কল-কারখানা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের বাড়তি দায়িত্বও এই নতুন রাষ্ট্রকে নিতে হয়েছে। এসব কারণে ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের পরিমাণ যা হওয়ার কথা ছিল তা হয় নি ফলে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহারও হয় নি।

স্পষ্টতই পরোক্ষ লোকসানের হিসেবটা আমরা করেছি যুদ্ধ না হলে পর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যে হারে বাড়তো সেই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে। সর্বশেষ পদ্ধতিতে আমাদের করা হিসেবে লোকসানের পরিমাণকে নীচের বর্ণিত দুটো কারণে অতিরঞ্জিত হয়েছে বলে যে কেউ অভিযোগ করতে পারে:
১.যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অস্থিরতা বা ওঠানামা ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের মাত্রা নিরূপণের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু স্বাভাবিক অবস্থায় ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের যে মাত্রা আমরা অনুমান করেছি তাতে এই অস্থিরতা বা ওঠানামার বিষয়টিকে বিবেচনায় নেয়া হয় নি সেহেতু দুটো সংখ্যার মধ্যে অসংগতি প্রকৃতপক্ষে ওপরে আমাদের উল্লিখিত লোকসানের পরিমাণের চেয়ে কম হতে পারে। তবে এই ভুলের মাত্রা কারও পক্ষে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয় কেননা কেউই নিশ্চিত নন ব্যবসা-বাণিজ্যের এই ওঠানামা কতটা বাইরের ঘটনাবলী অথবা কতটা যুদ্ধের লাগামহীন ধ্বংসযজ্ঞের প্রভাবে হয়েছে।

২.যদি কেউ যুক্তি তোলে অনুমিত যুদ্ধমুক্ত অর্থনীতিতে আমরা যে হারে প্রবৃদ্ধি হবে বলে ধরে নিয়েছি প্রকৃত হার তার চেয়ে কম সেক্ষেত্রেও লোকসানের পরিমাণ কম হবে। ১৯৭৪, ১৯৭৭ এবং ১৯৮০ সালের তেল সংকটও ছিল মারাত্মক আঘাতস্বরূপ যেহেতু বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হচ্ছিলো ক্রমবর্ধমান জ্বালানীর চাহিদা মেটানোর অর্থ যোগাতে। তেল গুরুত্বপূর্ণ পণ্য সন্দেহ নেই এবং ওপেক তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল চারগুণ কিন্তু এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য খাদ্যশস্যের দাম বিশেষ করে ১৯৭২-৭৩ এর দুর্বল ফলনের পর চারগুণ বেড়ে গিয়েছিল। বিশ্ববাজারেও খাদ্যশস্যের দাম বাড়ছিল হু হু করে: ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে রটারড্যামের নিলাম বাজারে মার্কিনী গমের দাম ছিল বুশেল প্রতি ৬ ডলার যা

আগের বছরের তুলনায় ৩.৩০ ডলার বেশি (Schertz; 1966:524)। খাদ্যশস্যের এই হঠাৎ দামবৃদ্ধির ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্য কেনার মত অর্থেও টান পড়তে থাকে আর এমন সময়ে এসব হচ্ছে যখন বাংলাদেশের সরকারী গুদামগুলিতেও খাদ্যশস্যের মজুদ স্বাভাবিকের চেয়ে কম ছিল। খাদ্যশস্যের সংকট চরমে এবং পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো যখন দেখা গেলো ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া প্রতিশ্রুত খাদ্যশস্যের চালান এসে পৌঁছুচ্ছে না।

এসব কারণে খাদ্য সংকট মোকাবেলার মত অবস্থা ছিল না যা এখন ১৯৭৩ সালের দুর্ভিক্ষ বলে পরিচিত।১১ খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে এসব মারাত্মক সমস্যার কথা বিবেচনায় নিলে অবশ্য আমাদের অনুমিত ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের ছকটা ধোপে টিকবে না। ভবিষ্যতে এ বিষয়ের ওপর গবেষণায় এই অস্থির বছরগুলোতে ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের পরিমাণ সঠিকভাবে যাচাইয়ের মাধ্যমে অসংগতিগুলো দূর করা সম্ভব।

৩. হিসেব-নিকেশের সারসংক্ষেপ

তথ্যের সীমাহীন ঘাটতির পাশাপাশি আবেগপূর্ণ মন্তব্য ও বিশ্লেষণের আধিক্যের দরুনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্থনৈতিক লোকসান বা ক্ষয়ক্ষতি কতটুকু সেই বিষয়ে এত বিতর্ক, মতবিরোধ এবং নানা ভাষ্য। আজও এই বিতর্কের অবসান কিম্বা ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন ঐকমত্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আলোচনা গবেষকের ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট বিশেষ করে যারা বিষয়টার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত (যেমন Jahan, Brownmiller, Rummel et al.,) এবং যারা অনেকদিন ধরে এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছেন (যেমন Mascarhenas, Lischultz, Parkinson et al.,) তাদের পক্ষে জোভিয়ান নিরাসক্তির দাবী করা অসম্ভব। এসব শর্ত ছাড়াও আমরা অনেকদিন ধরে তিনটি সম্ভাবনার ব্যাপারে নিরাবেগ সুশৃঙ্খল গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আসছি, এগুলি হচ্ছে: (ক) সার্বিক প্রবৃদ্ধির ওপর যুদ্ধের কোন প্রভাব পড়ে নি; (খ) যুদ্ধের প্রভাবে গতি মন্থর হয়েছে অথবা (গ) যুদ্ধ আসলে অর্থনীতির গতি ত্বরান্বিত করেছে। বিকল্পে কেউ আবার এই দাবী করতে পারে যে যুদ্ধ অর্থনীতির কিছু ক্ষেত্রে গতিসঞ্চার, কিছু ক্ষেত্রে গতিমন্থর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রভাব ফেলে নি; সুতরাং

প্রবৃদ্ধির হার যা হওয়ার কথা তাই হয়েছে, এর দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। এসব বিষয় ও আনুষাঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা এই নিবন্ধে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সেগুলি হচ্ছে:

১) বৈরিতার সূত্রপাত হয়েছিল বিবদমান উভয়পক্ষই যুদ্ধকে সবচে কম ক্ষতিকর বিকল্প ভেবে নেয়ার কারণে। এই যুদ্ধ এক পক্ষের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইন রক্ষার জন্য নিছক 'পুলিশী ব্যবস্থা'র চেয়ে কয়েকগুণ কিম্বা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দৃষ্টিতে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার জন্যে প্রাথমিক আহ্বানের চেয়ে শতগুণ বেশি এবং ব্যাপক হয়ে কেন দাঁড়ালো সেটা অনুসন্ধান করে দেখা ভবিষ্যত গবেষকদের জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে রইলো। আমরা মনে করি উভয় পক্ষই স্ব স্ব পক্ষে ঝুঁকির একটা হিসেব কষে নিয়েই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু ঘটনাবলী অপ্রত্যাশিত বাঁক নেয়ায় তাদের পূর্বনির্ধারিত হিসেব-নিকেশ ভেস্তে যায়।

২) প্রত্যক্ষ লোকসানের হিসেবে যুদ্ধের সব খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকে কেবল রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অলিখিত সম্পদ লুঠতরাজ এবং হাতিয়ে নেয়াসহ ইত্যাকার লোকসানগুলো বাদে। অন্যদিকে পরোক্ষ লোকসানের হিসেবে সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত থাকে যেহেতু যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া জনসাধারণের স্বাভাবিক ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের যে পরিমাণ লুপ্ত হয়ে গেছে সেটাও হিসেবের মধ্যে নেওয়া হয়। স্বভাবতই যে কারও পক্ষে এটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে প্রত্যক্ষ লোকসানের পরিমাণের চেয়ে পরোক্ষ লোকসানের পরিমাণ বেশি হবে এবং এই দুই সংখ্যার মধ্যে যে তফাৎ সেটাই প্রত্যক্ষ ক্ষয়ক্ষতির হিসেব থেকে বাদ পড়ে যাওয়া অংশ। তবে আমাদের হিসেবে দেখানো হচ্ছে বাংলাদেশ ২০.৩৮ বিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ এবং ১৪.০৮ বিলিয়ন ডলার পরোক্ষ লোকসানের সম্মুখীন (৫ শতাংশ মূলহ্রাস হার এবং যুদ্ধে প্রাণহানির সংখ্যা ৩,০০০০০ ধরলে)। যুদ্ধে প্রাণহানির সংখ্যা ১২,৪৭,০০০ ধরলে প্রত্যক্ষ লোকসানের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ২২.৭৫ বিলিয়ন ডলারে। দুটো ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষ লোকসানের পরিমাণ পরোক্ষ লোকসানের চেয়ে বেশি। এরকম হওয়ার একটা কারণ হতে পারে পরোক্ষ লোকসানের যে হিসেব আমরা করেছি তাতে যুদ্ধে যারা মারা গেছে তাদের ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের পরিমাণ যে হ্রাস পেতো সেটা আমরা বাদ দিই নি। হিসেবটা খুব সহজেই করা যায় – মৃতদের আয়ু যুদ্ধ না হলে পর যতটুকু হতো ততটুকু বিবেচনা করলেই হলো। যুদ্ধে প্রকৃত প্রাণহানির সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ থাকায় সারণী ৪-এ আমরা তা অন্তর্ভুক্ত করি নি।

৩) সবশেষে ১৪.০৮ বিলিয়ন ডলারের পরোক্ষ লোকসান থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে আমাদের বক্তব্য মতে বাস্তবে লোকসানের পরিমাণ জাতিসংঘের ত্রাণ কর্মসূচীর জরীপে (Faaland and Parkinson; 1976:12-এ উল্লিখিত) দাবীকৃত ২০০ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে অনেক বেশি। বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যানও এই সন্দেহ থেকে মুক্ত নয় যেহেতু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংকের টাকার উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১৯৭২ সালের এক তথ্যবিবরণীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ১.৬ বিলিয়ন ডলার। "প্রাণহানি, ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়া, শোক-সন্তাপের মত বিষয়গুলো আর্থিক মানদণ্ডে হিসেব করা যায় না" এই অজুহাত তুলে মন্ত্রণালয় অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করার দায়িত্ব থেকে নিস্কৃতি পেয়েছে।

সমালোচকরা আর যে যে কারণে আমাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারেন তা হচ্ছে: ১৯৬৯ সালকে আমরা ভিত্তিবছর হিসেবে ধরার ফলে যুদ্ধের প্রভাব সঠিকভাবে যাচাই নাও হতে পারে; যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব কিম্বা পরের বছরগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্যে সংকোচনের ফলে প্রবৃদ্ধির ওপর যুদ্ধের সঠিক প্রভাব যাচাইয়ে এই নিবন্ধের ব্যর্থতা; এবং সর্বোপরি যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তনের নিদর্শনস্বরূপ কতিপয় প্রধান শিল্প ও পণ্যের উৎপাদন হারের ওঠানামার ওপর আলোকপাত করতে ব্যর্থতা। কাঠামোগত ধ্বংসসাধনের হিসেবে আমরা যে সংখ্যাগত উপাত্ত ব্যবহার করেছি কিছু কিছু ঐতিহাসিক সে ব্যাপারেও প্রশ্ন তুলতে পারেন। কারণ তাঁদের মতে যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যুদ্ধোত্তর দেশের রাজনৈতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিফলিত গুণগত পরিবর্তনের মাঝে এবং যা প্রকৃতপক্ষে মৌখিক, ইতিহাসের সাধারণীকৃত সূত্রের অধীন তা আমাদের সংখ্যাগত বিশ্লেষণে পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ার কথা নয়।

জবাবে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ১৯৬৯ সালকে (সবদিক থেকে বিবেচনা করলে বছরটাকে স্বাভাবিক বলতে হয়) আমরা সঠিকভাবেই ভিত্তিবছর হিসেবে বেছে নিয়েছি। কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা যখন আসলো তখন অন্যান্য প্রসঙ্গও এখানে উল্লেখ করতে হয়: যুদ্ধের আগে থেকেই জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল; যুদ্ধের পর বিপরীতধর্মী দুই অর্থনৈতিক আদর্শের প্রবক্তাদের স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচি দেয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যুদ্ধের পর পর রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রাধান্যসম্বলিত যে অর্থনৈতিক

ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল পরবর্তী বছরগুলোতে দেখা গেছে ধীরে ধীরে সেই ব্যবস্থার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। অর্থনীতিকে বাজারমুখী করার যে পদক্ষেপ এখনও অব্যাহত তার ফলে জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটছে। ফলস্বরূপ বাংলাদেশে আজ কাঠামোগত পরিবর্তন যেটা সবচে বেশি চোখে পড়ছে সেটা হচ্ছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি এবং বণিক পুঁজির ক্রমবর্ধমান শিল্প পুঁজিতে রূপান্তর। তবে রূপান্তরের এই গতি বেদনাদায়কভাবে মন্থর এবং পূর্ণাঙ্গ হতে ঢের বাকী কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার কলকাঠি এখনও উঠতি শিল্পপতি-পুঁজিপতি শ্রেণীর করায়ত্ত নয়। যুদ্ধের দরুন মৌলিক রাজনৈতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা যাচাইয়ের জন্যে ভবিষ্যতের গবেষণায় পূর্বোল্লিখিত বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে। আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক পরিসরে বিষয়টার ওপর গবেষণা করা যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে পাকিস্তানের অর্থনীতির ওপর যুদ্ধের প্রভাব। বিশেষভাবে আমরা খতিয়ে দেখবো যদি বিকল্প (শান্তিপূর্ণভাবে) সমাধানের মাধ্যমে যেমন ক্ষতিপূরণ পাওয়া সাপেক্ষে মুক্তি কিম্বা একক সিদ্ধান্তে (ক্ষতিপূরণ ছাড়াই) মুক্তি পেতো তাহলে বাংলাদেশ লাভবান হতো কিনা। বিচ্ছেদ যেহেতু ঘটেছেই সেহেতু আমাদের বিশ্বাস ক্ষতিপূরণ দেয়া সাপেক্ষে বিচ্ছেদ মেনে নিলে পাকিস্তানের জন্যেও ঢের ভালো হতো।

তথ্যনির্দেশ:

১. ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা ভারতে ছেড়ে গেলে বাংলাদেশ পকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তরিত হয়। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এই মিলন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সুখকর ছিল না। হতাশাটা মূলত সৃষ্টি হয় স্বাধীনতার অর্থনৈতিক এবং আধুনিকায়নের সুফল ভোগ করতে না দেয়ায়। চরম আঞ্চলিক বৈষম্যের সরাসরি পরিণতি হয়ে দাঁড়ালো পাকিস্তানের ভাঙ্গন। বিচ্ছিন্নতাকামী রাজনৈতিক বিবাদ শেষপর্যন্ত নৃশংস গৃহযুদ্ধে পরিণত হলো। ভারত হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলে নয় মাস ধরে চলা যুদ্ধের হঠাৎ পরিসমাপ্তি ঘটে। লক্ষাধিক বাঙালি শরণার্থীকে প্রত্যাবর্তনের এবং চিরদিনের সামরিক শত্রু পাকিস্তানকে দুর্বল করার সুযোগ নেয়ার লক্ষ্যে ভারত ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পূর্ণ সামরিক অভিযান শুরু করে। মাসের পর মাস গেরিলা যুদ্ধে নাজেহাল পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা ব্যূহ অল্প সময়ের মধ্যে ধসে পড়ে। শেষপর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী

সেনাধিনায়ক নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে সম্মত হলে স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মলাভ করে।

২. যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি হিসেব করতে গিয়ে অনেকেই বিচিত্র সূত্র ব্যবহার করেছেন। গধংপধৎবহযধং (১৯৮৬:২১) "যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির তাৎক্ষণিক গণনাকারী" হিসেবে UNROD (ঢাকায় জাতিসংঘের ত্রাণ কর্মসূচি) প্রধান Dr. Viktor Umbricht এর কার্যালয়ে রক্ষিত এক বিশাল রেখাচিত্রের উল্লেখ করেছেন। UNROD হিসেব দিয়েছে কমপক্ষে ১৫ লাখ ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ করা দরকার হয়ে পড়েছিল; ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে খাদ্য এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে দরকার পড়েছিল ৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার; অতিরিক্ত খাদ্য আমদানীর জন্যে দরকার হয়েছিলো ৮ কোটি ডলার; রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার মেরামতিতে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার; অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনের জন্যে ১ কোটি ৩০ লাখ ডলার; শিল্প ও কৃষি সরঞ্জাম, অন্যান্য রসদ ইত্যাদির জন্যে ২০ কোটি ডলার। UNROD -এর হিসেবকে বিশ্বাসযোগ্য বলে সবার কাছে মনে হওয়ার কারণ অর্থ, খাদ্য, সরঞ্জাম এবং কারিগরি ক্ষেত্রে UNROD আজও আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদানের সবচে একক বড় উৎস।

৩. অস্থায়ী সরকারের কাছে জরুরী কাজ ছিল ভারতে আশ্রয় নেয়া লক্ষাধিক (Asian Recorder, 17(38),p.1030 এর মতে ১ কোটি) শরণার্থীর ভরণ-পোষণ। বিশ্বব্যাংকের এক হিসেবে (World Bank Report, 17 (41),p.10400) শুধু ১৯৭১-৭২ অর্থবছরেই শরণার্থীদের ত্রাণখরচ ৭০ কোটি ডলার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. ব্যক্তিগত বদান্যতার হৃদয়স্পর্শী এরকম উদাহরণের পাশাপাশি ১৯৭১ সালে নিউইয়র্কে রবি শংকর, জর্জ হ্যারিসন প্রমুখ আয়োজিত কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর কথাও উল্লেখ করতে হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে এই অনুষ্ঠানের অনুকরণে দুর্ভিক্ষ পীড়িত আফ্রিকার জন্যে ব্যাণ্ড এইড অ্যাণ্ড লাইভ এইড রিলিফ আয়োজিত হয়।

৫. Faaland and Parkinson; (1976:12)-এর দেয়া উদ্ধৃতিতে জাতিসংঘের ত্রাণ কর্মসূচীর দলিলে যুদ্ধে বস্তুগত ধ্বংসের পরিমাণ মার্কিনী ১২০ কোটি ডলার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংখ্যাটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে যেহেতু কোন পদ্ধতিতে হিসেব করে ওই অংকে উপনীত হওয়া গেছে

তার কোনও ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। মজার ব্যাপার হচ্ছে ১৯৭২ সালের শেষ নাগাদ যেখানে বাংলাদেশে জাতিসংঘের দেয়া সাহায্যের পরিমাণ ১২০ কোটি মার্কিনী ডলারে দাঁড়িয়েছে সেই একই সময়ে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ ত্রাণ কর্মসূচীর চালানো যুদ্ধের ধ্বংসলীলার ওপর "ধ্বংসপ্রাপ্ত ও মেরামত প্রয়োজন" সংক্রান্ত জরীপে এমন সম্পদের পরিমাণ ১২০ কোটি মার্কিনী ডলার বলে জানাচ্ছে। এখানে আসল উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয় এটা দেখানো– যুদ্ধে যে ক্ষতি হয়েছে তার সবটাই কেবল দু'বছরের মাথায় জাতিসংঘের সহায়তা কর্মসূচীর মাধ্যমে পুষিয়ে দেয়া হয়েছে।

৬. কেউ কেউ অবশ্য দাবী করতে পারেন এসব লোকসান হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করলেও সারণী ১-এ উল্লিখিত সংখ্যার বেলায় তেমন হেরফের হবে না কারণ কৃষি সরঞ্জাম যা নষ্ট হয়েছে সেগুলো বেশিরভাগই অনুন্নত এবং গ্রামাঞ্চলে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘরের বেশির ভাগই বাঁশের কুঁড়েঘর যেগুলোর এমনিতেই বছরান্তে মেরামত করা দরকার পড়ে।

৭. Rummel অন্যান্যদের কথাও উল্লেখ করেছেন যারা প্রাণহানির সংখ্যা ১০ লাখ থেকে ৩০ লাখ হিসেব করেছেন। স্বাধীনতার পর প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ডে যেসব প্রাণহানি হয়েছে সেই সংখ্যা কিন্তু আমরা আমাদের হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করি নি। ক্রোধান্ধ বিজয়ীদের হাতে প্রায় ১লাখ ৫০ হাজার লোক মারা গেছে Rummel;1991:p.334)। এর মধ্যে অবাঙালি যেমন তেমনি "ঘুষ দিয়ে অথবা জোর করে যেসব বাঙালিকে পাকিস্তানীদের সাথে সহায়তা করতে বাধ্য করা হয়েছিল" তারাও রয়েছে (Jahan;p.298)।

৮. যুদ্ধে পঙ্গু হয়ে যাওয়া অথবা আহত বেসামরিক ব্যক্তিরা তৃতীয় বিভাগে বর্ণিত আমাদের করা পরোক্ষ লোকসানের হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৯. Rummel লিঙ্গবিশেষের প্রতি পরিচালিত আক্রমণকে ইহুদি পুরুষদের বিরুদ্ধে নাৎসীদের পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের সাথে তুলনা করেছেন। "প্রদেশব্যাপী এই গণহত্যায় হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে বের করে ঘটনাস্থলেই মারা হতো...মুসলমান পুরুষদের মধ্যে কাদের বাধ্যতামূলক খৎনা হয় নি তা বের করার জন্যে শরীর তল্লাশী করা হতো। খৎনা হয়ে থাকলে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও খৎনা যাদের হয় নি তাদের বেলায় ছিল নির্ঘাৎ মৃত্যু।"

১০. বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের পর তিন বছরের মত অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার পর থেকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং উত্থানপতন নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের এক পর্যায়ে জেনারেল জিয়া ক্ষমতা দখল করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে জিয়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনেছিলেন কিন্তু বাস্তবে পাঁচ বছরের সময়সীমায় তাঁর বিরুদ্ধে ২০বার সেনাবিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছে এবং ২১বারের বার তিনি নিহত হন। (Mascarhenas; 1986:v) ।

১১. Choudhury (1985) -র মতে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার কারণ ১৯৭৩-৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিশ্রুত খাদ্যশস্যের চালান না পাঠানো। এটা সত্য যে পর্যায়ক্রমে বন্যা ও খরার দরুন দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে বাংলাদেশের জলবায়ুতে বন্যা ও খরা নৈমিত্তিক অনুষঙ্গ। কয়েক বছর অন্তর এই দুর্যোগ দেখা দেয় এবং এর ফলে বড়জোর বাস্তুচ্যুতি, খাদ্যদ্রব্যের চড়া মূল্য এবং অপুষ্টির হার বেড়ে যায়– দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় না।

১২. যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল টালমাটাল অবস্থায়, মতাদর্শগত বিরোধের কারণে এসব প্রতিষ্ঠানে বিপরীতমুখী টানাপোড়েন লক্ষণীয়। ব্যাপারটা খোলাসা করা যাক: ১৯৭১ সালে দেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করলো তার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জনের বিজয় সূচিত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রকে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূল বলে ঘোষণা করা হলো। এসব আদর্শকে পিছনে ঠেলে দেয়া হলো যখন ১৯৮৮ সালের ৮ জুন বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হলো। অনেকের মতে জাতিত্ব এবং ধর্মের মধ্যে এই দোদুল্যমানতা রাজনৈতিক স্বার্থেই করা হয়ে থাকে যার ফলে বাংলাদেশের সাথে তার বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সূত্র নির্দেশ:

Asian Recorder (1971), Effect of Refugee Influx on Economy, *World Bank Report,* 17(41).

Asian Recorder (1971), Toroal Refugees, 17(38).

Bhattacharyya, S.K., (1988), *Genocide in East Pakistan/ Bangladesh: A Horror Story,* A Ghosh Publishers, Calcutta, India.

Brownmiller, S., (1993), Against Our Will: Men, Women and Rape, Fawcett Books, New York.

Choudhury, Saud A., (1982), *Food Policy, Inequality and Underdevelopment: The Political Economy of Food and Famine in Bangladesh:*, Unpublished M.A. Thesis, McGill University, Montreal, Canada.

Easterly, W and Levine, R., (1999). *It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models,* Mimeo, World Bank and University of Minnesota, September 1999.

Easterly, W and Yu, Hairong (2000). Global Development Network Growth Database. World Bank.

Faaland, J. and J. R. Parkinson (1976). *Bangladesh: The Test case for Development,* C. Hurst and Co., London.

Heston, Alan and Summers, Robert (1998): Penn World Tables.

Jahan, Rounaq (1972). *Pakistan: Failure in National Integration,* Columbia University Press, New York.

Jahan, Rounaq (1980). *Bangladesh Politics: Problems and Issues.* Dhaka University Press Ltd., Dhaka.

Lifschultz, Lawrence (1979). *Bangladesh: The Unfinished Revolution,* Zed Press, New York.

Mascarenhas, A. (1972). *The rape of Bangladesh,* Vikas, Delhi.

Mascarenhas, A. (1986). *Bangladesh: A Legacy of Blood,* Hodder and Soughton Ltd., Suffolk, England.

Ministry of Information (1972). Physical Capital Destruction. Collected from War Museum, Segunbhagicha, Dhaka 1000

Rummel, R.J. (1997). *Death By Government,* Transaction Publishers, London, U.K.

Schertz, Lyle P., (1974). World Food Prices and the Poor, *Foreign Affairs,* April, 1974.

Sisson, Richard and Leo E. Rose (1991). *War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh,* University of California Press, California.

United Nations Relief Operations (1972). Survey of Damages and Repairs, Dhaka, Bangladesh.

---

* ইংরেজিতে রচিত মূল গবেষণা পত্রের অনুবাদ: ইকবাল করিম হাসনু